কনসেপ্ট অ্যাডভার্টাজিং
অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন
৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানলতা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত নিরপেক্ষ পাক্ষিক সংবাদপত্র

রাঢ় আলাপন

অলঙ্কারের দুনিয়ায় একমাত্র ভরসা
শোভা জুয়েলার্স
চকবাজার গলি (স্টল নং-৫), বাঁকুড়া
ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

Postal Registration No. SSP (BKU)/RNP-33 *email: aalaapan123@gmail.com* *RNI No.: WBBEN/2004/14957*

● বর্ষ ১২ ● ● সংখ্যা ২১ ● ● ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ ● ● মূল্য ২.০০ টাকা ●

প্রহর গুনছে কমলপুর

আলাপন প্রতিনিধি: অনেকদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে কাউন্টডাউন। সোশাল সাইটে চলছে জোরদার প্রচার। কে আসছে, কে আসতে পারছে না, সারাদিন চলছে এই আলোচনা। দেশের বাইরে থাকেন, এমন কেউ কেউ এবার পুজোয় আসেননি। সামনে স্কুলের অনুষ্ঠান আছে যে! এলে ওই সময়েই আসবেন। পুজোয় তো প্রতিবারই আসা হয়। কিন্তু এতদিনের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া, বারবার তো এই সুযোগ আসবে না। কেউ কুড়ি বছর ধরে পড়ে আছেন ভিনরাজ্যে। তিনিও টিকিট কেটে রেখেছেন দু'মাস আগেই। পরে যদি না পাওয়া যায়!

সাজো সাজো রব পড়ে গেছে কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলের হীরক জয়ন্তীকে ঘিরে। দশ বছর আগে, সুবর্ণ জয়ন্তীতেও একটা মিলনমেলা হয়েছিল। এবারের উন্মাদনা যেন তাকেও ছাপিয়ে গেছে। একসঙ্গে একই দিনে পাওয়া যাবে প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্রদের। কত টুকরো টুকরো স্মৃতি জমে আছে। একসঙ্গে ভাগ করে নেওয়া কত দুষ্টুমি। বাংলার প্রায় প্রতিটি মেডিকেল কলেজে প্রতিবছর কমলপুরের ছাত্র থাকবেই। প্রথমসারির সব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেখুন। সেখানেও কমলপুরের অনিবার্য উপস্থিতি। কর্পোরেট দুনিয়া থেকে শিক্ষার দুনিয়া, সেখানেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কমলপুর।

নেতাজির নামে স্কুলের নামকরণ। তাঁর জন্মদিনেই প্রতিষ্ঠা। তাই অনুষ্ঠানের সূচনা ২৩ জানুয়ারি। সেইদিন জমিদাতাদের ও প্রাক্তন শিক্ষকদের সংবর্ধনা। মাঝে সরস্বতী পুজো, প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য বিরতি। পুরোদমে অনুষ্ঠান শুরু ২৯ জানুয়ারি। চলবে তিন দিন। নানা রকম অনুষ্ঠানে সাজানো হয়েছে হীরক জয়ন্তীর সূচি। থাকছে বর্তমান ছাত্রদের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলার মন্ত্রী থেকে শিক্ষাবিদ, হাজির থাকছেন অনেকেই। ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি। শেষদিনে বাংলা ব্যান্ড সুরজিৎ ও বন্ধুরা। শেষদিনের আরও একটি আকর্ষণ পুনর্মিলন। সেদিন হারিয়ে যাওয়া সাথীকে খুঁজে নেওয়ার দিন। 'পুরানো সেই দিনের কথা'য় হারিয়ে যাওয়ার দিন।

কবিতার সন্ধ্যা

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়

তিরিশ তারিখ কমলপুরে যাচ্ছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। একটি সন্ধ্যা হোক শুধু কবিতার জন্য।

একটা স্কুল তার পঞ্চাশ বছর বা ষাট বছর উদযাপন করতেই পারে। সবাই নিজেদের মতো করে এই আয়োজন করে। কিন্তু যখন কোনও স্কুল কোনও আবৃত্তিশিল্পীকে নিয়ে যায়, তখন তাদের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্কুলের একটা সুনাম আছে। দেশে, বিদেশে ছড়িয়ে আছে কৃতী ছাত্ররা। তাদের সামনে কবিতা শোনানোর মধ্যে একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

আগে এই আবৃত্তিটাকে শহরকেন্দ্রীক মনে করা হত। কিন্তু এখন বিভিন্ন জেলায় আবৃত্তির নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতেও অনেক অনুষ্ঠান করেছি। একেক অনুষ্ঠানের চরিত্র একেক রকম। শ্রোতাদের মন বুঝেই কবিতা নির্বাচন করতে হয়। কিছু চেনা কবিতা, কিছু নতুন কবিতা। স্কুলের অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক, সেইসঙ্গে স্কুলজীবনকে নিয়ে লেখা কবিতা বেশি আবৃত্তি করি। এখানে কী করব, তা এখনও ঠিক করিনি।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার একটা নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা আছে। সেই ভাষাও বেশ শ্রুতিমধুর। এই আঞ্চলিক ভাষায় অনেক কবিতাও আছে। কিন্তু আমরা তো ছোট থেকে এই ভাষায় অভ্যস্থ নই। তাই সেই আঞ্চলিক ভাষার কবিতা খুব একটা আবৃত্তি করা হয় না। সবাই আসুন, উৎসবের মাঝে একটা সন্ধ্যা কবিতার জন্য তোলা থাক।

প্রাক্তনরা নিষ্ক্রিয় কেন?

ডা. অশোক কর

একেবারে গ্রামের স্কুল বলতে যা বোঝায়, কমলপুর ছিল ঠিক তাই। সবাই স্থানীয় ছাত্র। শিক্ষকরাও স্থানীয়। সেই স্কুলটাই কিন্তু জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিল। সেদিনের সেই ছাত্রের বয়স আজ পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেল। তখনও গোবর্ধনবাবু আসেননি। হেডস্যার ছিলেন দুলালবাবু। রাস্তাও ছিল না, ঘরবাড়ি বা দোকানপাটও ছিল না। টিউশনি বলতে কী বোঝায়, জানতামও না। আমার বাড়ি শালচুড়া গ্রামে। সেখান থেকে হেঁটেই স্কুলে আসতাম।

স্কুল ফাইনালে ভাল রেজাল্টের পর প্রি ইউনিভার্সিটি। তারপর প্রথমে ভর্তি হয়েছিলাম শিবপুর বি ই কলেজে। একমাস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্লাসও করলাম। তারপর একজন বললেন, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কী করবি? কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ডাক্তারিতে ভর্তি হয়ে যা। তখন স্কুল ফাইনাল ও প্রি-ইউনিভার্সির রেজাল্টের ভিত্তিতে মেডিক্যালে ভর্তি হতে হত। স্কুল ফাইনালে ছিলাম রাজ্যের ১৮ নম্বর, আর প্রি ইউনিভার্সিটিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নম্বরই ছিল সবথেকে বেশি। ফলে, সুযোগ পেয়ে গেলাম। হওয়ার কথা ইঞ্জিনিয়ার, হয়ে গেলাম ডাক্তার।

দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে গেল। কমলপুরের ছবিটাও বদলে গেছে। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছে ছাত্ররা। তবে আমার খুব খারাপ লাগে যখন দেখি সেই প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে অ্যালুমনি আছে, কমলপুরের থাকবে না কেন? স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু কেউ কোনও উদ্যোগ নেয়নি। আমি স্পষ্ট কথার মানুষ। মন জুগিয়ে কথা বলতে পারি না। তাই আমাকে হয়ত অনেকে এড়িয়েই চলে।

পরবর্তী অংশ তৃতীয় পাতায়

অন্য স্কুলের প্রেরণা হতে পারে কমলপুর

শুভাশিস বটব্যাল

সেই ছোটবেলা থেকে কমলপুরের নাম শুনে আসছি। শুনে আসছি, ভাল ছেলেরা কমলপুর যায়। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা অবশ্য কমলপুর থেকে অনেকদূরে। তাই কমলপুরে পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে যখনই উচ্চ মাধ্যমিক বা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট বের হত, কমলপুরের নামটা আবার ভেসে উঠত। মাঝে মাঝে মনে হত, ইস্, কমলপুরে যদি পড়তে পারতাম!

আমি অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্র নই। আমার বিষয় কৃষি অর্থনীতি। রাজনীতির সূত্রে কিছুটা হঠাৎ করেই কমলপুরের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া। বিধানসভায় আমাকে যখন ছাতনা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হল, শুরুতে কিছুটা খারাপই লেগেছিল। মনে হয়েছিল, ওখানকার লোকজন আমাকে চেনে না। তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে কী করব? দলনেত্রীকে (এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী) বলেওছিলাম সে কথা। তিনি বললেন, ওখানেই দাঁড়াতে হবে। অনেক কাজ করার সুযোগ আছে।

যে কয়েকটি বিষয়ের জন্য রাজি হয়েছিলাম, তার একটি অন্যতম কারণ কমলপুর। এই জায়গাটার প্রতি একটা আলাদা দুর্বলতা আছে। আমি প্রায়ই কমলপুরে আসি। বাইরে গিয়ে গর্ব করে বলি, জেলার সেরা স্কুল কমলপুর আমার বিধানসভার মধ্যে। জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন হাসপাতালে যেতেই হয়। যেখানেই যাই, ডাক্তারবাবুদের জিজ্ঞেস করি, কোথায় পড়াশোনা করেছেন। কেন জানি না, মনে হয়, কেউ না কেউ ঠিক কমলপুরের ছাত্র বেরিয়ে যাবেন। এভাবেই কত ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

শুধু ভাল ছাত্র ভর্তি করে ভাল রেজাল্ট হয়েছে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আমার প্রশ্ন, ভাল ছাত্ররা এখানে আসে কেন? তাঁদের অভিভাবকরা ছেলেদের এখানে পাঠান কেন ? সহজ উত্তর, এখানে পড়াশোনা হয় বলেই অভিভাবকরা ছেলেদের পরম নিশ্চিন্তে পাঠাতে পারেন। তিল তিল

পরবর্তী অংশ তৃতীয় পাতায়

সবার উপরে মানুষ সত্য

সম্পাদকীয়

বারো পেরিয়ে

দেখতে দেখতে কেমন বারো বছর পেরিয়ে গেল। ২০০৩ এর ১২ জানুয়ারি। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আতুড়ঘরে জন্ম নিল এক নবজাতক। নাম আলাপন। সেদিন কে জানত, পায়ে পায়ে এতটা পথ পেরিয়ে আসব!

বাংলার নানা প্রান্তে পত্রপত্রিকার অভাব নেই। নিজের নিয়মেই সে জন্ম নেয়। কেউ এগিয়ে চলে। কেউ চিরতরে হারিয়ে যায়। আমরাও হারিয়ে যেতে পারি, এমন আশঙ্কা শুরুর দিন থেকেই ছিল। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সে ঠিক এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলা যে সবসময় খুব মসৃন হয়েছে, এমন নয়। কখনও এসেছে চোখরাঙানি। কখনও প্রচ্ছন্ন হুমকি। পথ চলতে গিয়ে কখনও আলাপন হোঁচট খেয়েছে। ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। একটি ব্লকের পরিসর ছাড়িয়ে যে ডালপালা মেলছে গোটা জেলায়। শুধু জেলায় কেন, ইন্টারনেটের সূত্রে সে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের নানাপ্রান্তে।

যাঁরা নতুন পাঠক, তাঁদের মনে হতে পারে, এই কাগজ সরকার বিরোধী। কী আশ্চর্য্য, আগে যাঁরা শাসক ছিলেন, তাঁরাও এমনটাই মনে করতেন। তাঁরাও ভাবতেন, আমরা সরকার-বিরোধী, আমরা বাম বিরোধী। হ্যাঁ, পরিস্থিতির দাবিতে আগের বাম সরকারের নানা ভূমিকায় আমরা সমালোচনা করেছি। কখনও মৃদু, কখনও তীব্র। তবে অনর্থক ব্যক্তি আক্রমণ নয়, সমালোচনার সময় যুক্তিনিষ্ঠ থাকারই চেষ্টা করেছি। মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। তবু যাঁরা বহু বছর ধরে রাঢ় আলাপন পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, এই ভূমিকার কথা তাঁদের অজানা নয়। 'ফিরে দেখা' বিভাগে মাঝে মাঝে সেই লেখা ছাপাও হয়। সেগুলো ভাল করে পড়লেই বুঝতে পারবেন, অতীতে আমাদের অবস্থান কী ছিল। সেদিনও আমরা ছিলাম অতন্দ্র প্রহরী। সরকার বা শাসক দল ভুল করলে সেদিনও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি।

ভাবতে ভাল লাগছে, রাঢ় আলাপন এখনও তাঁর মৌলিক অবস্থান থেকে সরে আসেনি। এখনও সরকারের বা শাসক দলের ভুল দেখলে সে গর্জে ওঠে। এখনও প্রশাসনকে মেরুদণ্ডহীন অবস্থায় দেখলে সে তাঁদের ধিক্কার জানাতে ভোলে না। জেলাশাসক থেকে পুলিশ সুপারকে রেয়াত করে না। এমনকি সভাধিপতি বা মন্ত্রীকেও লাল কার্ড দেখাতে দ্বিধা করে না। কাজ করতে গেলে ভুল হতেই পারে। সেই ছোটখাটো ভুলকে বড় করে দেখা উচিত নয়। এমন অনেক ছোটখাটো ভুলকেই উপেক্ষা করছি। ইচ্ছে করেই প্রচারের আঙ্গিনায় আনছি না। কিন্তু যেখানে সামান্য সদিচ্ছাটুকুও নেই, যেখানে উদ্দেশ্যটাই অসৎ, সেখানে তো সোচ্চার হতেই হয়। তবে সেই সোচ্চার হতে গিয়ে ভাল কাজটাকে সাধুবাদ জানাতে ভুলে যাব না, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত থাকতে পারেন। যাঁকে লাল কার্ড দেখানো হচ্ছে, অন্য কোনওদিন, অন্য কোনও বিষয়ে তাঁর অবস্থানকেই যদি ভাল বলে মনে হয়, লাল গোলাপ তুলে দিতেও কোনও কুণ্ঠা থাকবে না।

এবারের রাঢ় আলাপনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে কমলপুর নেতাজি হাইস্কুল। নিছক একটি স্কুল নয়, গ্রাম বাংলা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটি প্রতিষ্ঠান। হীরক জয়ন্তী উৎসবের আগে ৬০ বছরের পথ চলাকে নানা আঙ্গিক থেকে একটু ফিরে দেখা। জেলার অন্যান্যপ্রান্তের খবর হয়ত সেভাবে দেওয়া গেল না। আসলে, এমন গর্বের মুহূর্ত তো বারবার আসে না। শুধু কমলপুরের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও। তাঁরাও জানুন এই স্কুলের ঐতিহ্য, পরম্পরা।

রাঢ় আলাপনের নতুন কার্যালয়ের ঠিকানা

রাঢ় আলাপন

কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার,

বাঁকুড়া, পিন— ৭২২১০১

এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন। আগের মতো ই-মেলেও পাঠাতে পারেন। ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

চিঠিচাপাটি

কেঞ্জাকুড়ার গামছা ফ্লিপকার্টে!

কর্মসূত্রে বাঁকুড়ার বাইরে থাকি। তবু মন পড়ে থাকে এই লাল মাটির দেশে। বাঁকুড়া জেলার সম্পর্কে কোনও ভাল খবর পেলে মন ভাল হয়ে ওঠে। উল্টোটাও সত্যি। অর্থাৎ, খারাপ কোনও খবর পেলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যাকে চিনি না, জানি না, তার সফল্যেও কেমন যেন গর্ব হয়। মনে হয়, এ তো আমার জেলার মানুষ। তখন আর অচেনা মনে হয় না।

আমার এই গর্ববোধ বাড়িয়ে তোলে রাঢ় আলাপন। সত্যি যেন রাঢ়ের গন্ধ মাখানো। বাঁকুড়াকে যেন নতুন করে আবিস্কার করি। যেমন, গতমাসে প্রথম পাতার ছোট্ট প্রতিবেদনে জানলাম, কেঞ্জাকুড়ার গামছা নাকি ফ্লিপকার্টে বিক্রি হবে। আপাতভাবে মনে হবে, এটা মামুলি একটা খবর। কিন্তু মারামারি, সন্ত্রাস এসব খবরকে ছাপিয়ে এই খবর যখন প্রথম পাতায় উঠে আসে, তখন আপনাদের রুচির পরিচয় পাই। আমার মতো প্রবাসীদের মনে অন্য এক নস্টালজিয়া তৈরি হয়। মনকে কোথাও একটা স্পর্শ করে যায়। রাঢ় আলাপন এরকম খবরই উপহার দিয়ে যাক। আমাদের শিকড়ের কাছাকাছি নিয়ে যাক।

সৈকত ঘোষাল, *বেঙ্গালুরু*

মেলার কথাও থাকুক

শীতকাল মানেই মেলার সময়। বাঁকুড়া জেলা লোকসংস্কৃতির জন্য বরাবরই সমৃদ্ধ। ছোট থেকেই দেখে এসেছি মকরের সময় টুসু পরব। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের মেলা বসে। শীতের রোদ গায়ে মেখে সেই মেলা দিব্যি উপভোগ করতাম।

অনেক মেলা এখন উঠে গেছে। আধুনিক প্রজন্মকে এগুলো বোধ হয় আর টানে না। তারাও ফেসবুক, টুইটারে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, গ্রামীণ মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানা রমক মেলা হয়। হয়ত জৌলুস আগের মতো নেই। তবু হয়। রাঢ় আলাপন কি পারে না সেই মেলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে ? তাহলে এই প্রজন্ম হয়ত জানতে পারবে, তাদের অতীত কতখানি সমৃদ্ধ।

রাতুল দত্ত, *সোনামুখী, বাঁকুড়া*

চেনা দুঃখ চেনা সুখ

রাঢ় আলাপনের সবথেকে জনপ্রিয় বিভাগ কী ? একেক জন একেক রকম উত্তর দেবেন। আমার মনে হয়, সবথেকে জনপ্রিয় 'স্মৃতিটুকু থাক'। ছাপা কাগজ সবসময় হাতে পাই না। ভরসা সেই পিডিএফ ফাইল। পড়তে তেমন সমস্যা হয় না। সবার আগে চলে যাই ছয়ের পাতায়। সত্যিই এটা পাঠকদের মুক্তমঞ্চ। যে যা খুশি, মনের কথা লিখতে পারে। প্রথমদিকে হয়ত অনকের জড়তা থাকত। এখন বোধ হয় সেটা কেটেছে। আমার নিজের কয়েকটা লেখা ছাপা হয়েছে ওই কলামে। নিজের মনের কথা, অনেক দিনের পুরানো কথা বলতে পেরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। অকপটে নিজের ভুলও স্বীকার করতে পারি। তখন অনেকটা হালকা লাগে।

পত্রিকাগোষ্ঠীর কাছে অনুরোধ, মাত্র তিনটি চিঠি নয়, এই বিভাগে আসা আরও কয়েকটি চিঠি ছাপুন। অন্তত একটা পুরো পাতা বরাদ্দ হোক এই বিভাগটার জন্য। জেলার নানা প্রান্তের ছোট ছোট হাসি কান্নার অনুভূতিগুলো উঠে আসুক।

বিশ্বজিৎ রক্ষিৎ, *ঝাঁটিপাহাড়ি*

চিঠি লিখুন

চিঠিপত্রের এই বিভাগটি পাঠকদের মুক্তমঞ্চ। আপনিও আপনার মনে কথা লিখুন। রাঢ় আলাপনকে ঘিরে আপনার অনুভূতির কথা লিখুন। প্রকাশিত কোনও খবরের বিষয়ে যদি কোনও বক্তব্য থাকে, নিঃসঙ্কোচে লিখুন। সমালোচনাও করতে পারেন। সব ধরনের মতামতই সাদরে গ্রহণ করা হবে।

চিঠি লেখার ঠিকানা:

রাঢ় আলাপন, কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া, পিন—৭২২১০১

ইমেলেও নিজের মতামত পাঠাতে পারেন।

ঠিকানা:aalaapan123@gmail.com

একের সঙ্গে দশের তেমন ফারাক নেই

মানস কর্মকার

ওই দিনটার কথা হয়ত ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কারণ, এমন মুহূর্ত মানুষের জীবনে বারবার আসে না। আসলে, তখন আনন্দ হলেও পরে মনে হয়েছে, এটা নিয়ে সারাজীবন স্মৃতির যাবর কাটা উচিত নয়। তাই এখনও ওই প্রসঙ্গ এলে কিছুটা গুটিয়েই থাকি। অনেকে জানতে চায় যেদিন উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হলাম, সেদিন ঠিক কী কী ঘটেছিল। বিশ্বাস করুন, সেদিনের সব কথা সত্যিই মনে নেই।

তখন তো টিভিতে এমন ঘনঘন ব্রেকিং নিউজ ছিল না। প্রেস কনফারেন্সের লাইভ টেলিকাস্টও ছিল না। তাছাড়া আমি উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের প্রথম হব, এমন প্রত্যাশাও ছিল না। তাই সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পাইনি। যতদূর মনে পড়ে, আমার দাদু আমাকে প্রথম খবরটা দিলেন। দাদুকে বোধহয় কেউ একজন ফোন করে খবরটা জানিয়েছিলেন। কে জানিয়েছিলেন, সে প্রশ্নটা কখনও মাথায় আসেনি।

আমার বাড়ি সোনাথলি পেরিয়ে রাউতোড়া গ্রামে। গ্রাম বলতে যা বোঝায়, সেরকমই। ক্লাস নাইনেই ভর্তি হয়েছিলাম কমলপুরে। মাধ্যমিকেও বোর্ডের নাইনথ হয়েছিলাম। সেবারও কিন্তু এক থেকে দশের মধ্যে থাকব, এমন প্রত্যাশা ছিল না। সেদিনও প্রথমে একটু আনন্দ হয়েছিল। ব্যস, ওইটুকুই। এর বেশি কিছু নয়। সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলাম বলেই বোধ হয় পা দুটো মাটিতে ছিল। তাই হয়ত নিজের ফোকাসটা ঠিক রাখতে পেরেছিলাম।

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হওয়ার পরেও জীবনে বিরাট কিছু বদল আসেনি। কারণ, আমার মনে হয়, যে ফার্স্ট হয় আর যে দশ নম্বরে থাকে, তাদের মধ্যে বিরাট কোনও ফারাক নেই। সবাই প্রায় একই গোত্রের ছাত্র। কেউ দু'নম্বর কম পায়, কেউ দু'নম্বর বেশি পায়। যে দশ নম্বরে, সেও যে কোনওদিন আমাকে হারিয়ে দিতেই পারে। এতে বিরাট কোনও বিশ্বজয় করলাম, এমনটা না ভাবাই ভাল। তবে বয়স কম ছিল তো। তাই তখন একটা আনন্দ হয়েছিল, এটা অস্বীকার করব না। আমার থেকেও বেশি আনন্দ পেয়েছিলেন আমার মাস্টারমশাইরা। রেজাল্টের দিন স্কুলে যাওয়া হয়নি। গিয়েছিলাম তার পরের দিন। তখন টিচার ইনচার্জ ছিলেন মণ্ডলবাবু। খুব মনে পড়ছে স্যারদের কথা। দিব্যেন্দুবাবু, তুষারবাবু, পাত্রবাবু, মনোজবাবু, ভরতবাবু, ভবতোষবাবু। এখনও মুখগুলো ভেসে ওঠে।

মনে পড়ে আরও একজনের কথা। তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু তিনিও তো মাস্টারমশাই, সাগরবাবু। এই মানুষগুলোকে যদি পাশে না পেতাম, জানি না কী হত। আজ যেখানে আছি, হয়ত সেখানে থাকতাম না। আর 'উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম' এই তকমাটাও থাকত না।

(লেখক জোকা ই এস আই হাসপাতালে কর্মরত। ২০০২ মাধ্যমিকে রাজ্যের নবম, ২০০৪ উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের প্রথম)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের মেধা তালিকায় কমলপুর

বছর	পরীক্ষা	স্থান	ছাত্র
১৯৬৫	মাধ্যমিক	১৮	অশোককুমার কর
১৯৭৮	মাধ্যমিক	১৫	মনোরঞ্জন মণ্ডল
১৯৮০	উচ্চ মাধ্যমিক	১৭	মনোরঞ্জন মণ্ডল
১৯৯৭	মাধ্যমিক	১১	সমীর কুমার মাহাতো
১৯৯৮	মাধ্যমিক	৯	মহাদেব পাত্র
২০০২	মাধ্যমিক	৮	মানস কর্মকার
২০০২	মাধ্যমিক	১৯	মানস মাজি
২০০২	উচ্চ মাধ্যমিক	১৬	উষ্ণীষ মুখার্জি
২০০৪	উচ্চ মাধ্যমিক	১	মানস কর্মকার
২০১১	মাধ্যমিক	৭	অচিন্ত্য দে
২০১১	উচ্চ মাধ্যমিক	৫	সৌভিক ভাণ্ডারী

এগিয়ে এলেন সাগরবাবু

আলাপন প্রতিনিধি: তিনি কমলপুর স্কুলের শিক্ষক নন। কোনও স্কুলেরি শিক্ষক নন। কিন্তু অনেকের মাস্টারমশাই। কমলপুরের অনেক ছাত্রের সফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁরও নাম। মানস কর্মকার থেকে শিবশঙ্কর মাহাতো, এই কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলুন। স্কুলের স্যারদের পাশাপাশি উঠে আসবে আরও এক 'স্যার'য় এর কথা। তিনি সাগরবাবু। পুরো নাম সাগর দেওঘুরিয়া।

এই স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অনেকটা পারিবারিক। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন তাঁর বাবাও। নিজেও এই স্কুলেরই ছাত্র। পেশা গৃহশিক্ষকতা। ছাত্রদের জন্য অবারিত দ্বার। হীরক জয়ন্তীর আগে উজ্জ্বল এক ভূমিকায় দেখা গেল সাগরবাবুকেও। স্কুলে এসে হীরক জয়ন্তীর জন্য দিয়ে গেলেন আর্থিক সাহায্য। দিয়ে গেলেন আরও তিরিশ হাজার টাকা। কথা দিয়ে গেলেন, যতদিন তিনি টিউশনি পড়াবেন, প্রতিবছর সাহায্য করে যাবেন। সেই টাকা থেকে যেন দুস্থ ছাত্রদের বই কিনে দেওয়া হয়। ততদিন যেন এই তিরিশ হাজার টাকা রেখে দেওয়া হয়। যেদিন দিতে পারবেন না, তারপর থেকে এই টাকার সুদে যেন ছাত্রদের বই কিনে দেওয়া হয়। প্রচারবিমুখ আগরবাবু চান না বিষয়টি নিয়ে হইচই হোক। তাই নিঃশব্দেই নিজের দান করে গেলেন। যা আগামীদিনে হয়ত অনুপ্রাণিত করতে পারে আরও অনেককেই।

প্রাক্তনরা নিষ্ক্রিয় কেন?

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আপনারাই বলুন, আমি ঠিক বলছি কিনা। আমাদের প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর পরিচিতি আছে। আমি তো বলেছিলাম, আপনারা উদ্যোগ নিন। আমি সাহায্য করব। কেন আমরা বছরে একবার মিলিত হতে পারি না? এই সোশাল মিডিয়ার যুগে সেটা কি খুব কঠিন? কেন আমরা সবাই স্কুলকে সাহায্য করতে পারি না? সেই টাকা স্কুলেরই কাজে লাগত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাউকে এগিয়ে আসতে দেখিনি।

পঞ্চাশ বছরে বা ষাট বছরে শুধু একটা অনুষ্ঠান করলে হবে না। নিয়মিত এই যোগাযোগ যেন থাকে। প্রাক্তন ছাত্রদের আরও বেশি করে সামিল করা হোক।

(লেখক প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ)

অন্য স্কুলের প্রেরণা হতে পারে কমলপুর

প্রথম পাতার পর

করে এই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এখানে শৃঙ্খলাটা সবার আগে। সেই ট্র্যাডিশনটা বরাবরই ধরে রেখেছেন এখানকার শিক্ষকরা। ল্যাবরোটারি আর লাইব্রেরির উন্নয়নের জন্য কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছি। ভবিষ্যতেও এই স্কুলের যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে পাশে পাবেন।

শিক্ষার পরিবেশ কেমন হয়, কমলপুর তার একটা মডেল হতে পারে। জেলার বিভিন্ন স্কুল এই ব্যাপারে কমলপুরকে অনুসরণ করতে পারে। এই স্কুল আরও, আরও অনেক এগিয়ে যাক। ছাত্র হতে পারিনি। কিন্তু কমলপুরের গর্বে শরিক হতে বাধা কোথায়!

(লেখক ছাতনার বিধায়ক ও কৃষি দপ্তরের পরিষদীয় সচিব)

গ্রাহক হোন

বাড়িতে বসেই পেতে পারেন রাঢ় আলাপন। পেতে পারেন বাঁকুড়া জেলার নানা খবর।

দেশের যে প্রান্তেই থাকুন, আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে বাঁকুড়ার কণ্ঠস্বর।

নিজের নাম ঠিকানা পাঠিয়ে দিন।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০০ টাকা (ডাক খরচ সহ)।

যোগাযোগ করুন ৯০০৭৪ ৬৭১২৩ নম্বরে।

ইমেল বা ফেসবুকেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

টেলিফোনে কোনও খবর জানাতে চান?

ফোন করুন ৯৮৩১২২৭২০১

হেড স্যারের উপর সেই অভিমান আর নেই

ডা. শান্তনু পন্ডা

প্রিয় পাঠক,

লেখার অভ্যেস অনেক দিন আগেই ত্যাগ করেছি। কিন্তু এই কাগজটি আমি নিয়মিত পড়ি। বাঁকুড়া সম্পর্কে, কমলপুর সম্পর্কে মাঝে মাঝেই নানা খবর পাই। মনে মনে সেই পুরানো দিনগুলোতে ফিরে যাই। পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধ অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার নেই। আমাদের সম্পর্কের যোগসূত্র সেই কমলপুর।

তাই কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলকে নিয়ে লেখার প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেললাম। কমলপুর স্কুলকে নিয়ে প্রশস্তিমূলক কোনও কথা বলার আবশ্যকতা নেই। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বাঁকুড়াসহ রাঢ় বাংলার যে কোনও ভাল ছেলের গন্তব্যস্থল হয় কমলপুর। অন্তত সবার মনেই স্বপ্ন থাকে, সে কমলপুরে ভর্তি হবে। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি সিমলাপাল হলেও আমারও উচ্চমাধ্যমিক পড়া হয় এই কমলপুর স্কুলে। আজও গর্ব অনুভব করি এই স্কুলের ছাত্র হিসেবে। অনেক স্মৃতি আছে স্কুলকে ঘিরে। বহু ঘটনা, অনুভূতি আজও হৃদয়ের গোপন গহ্বরে সযত্নে গচ্ছিত আছে। যেগুলো মনে পড়লে, কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকলেও কমলপুরের কথা, স্কুল ক্যাম্পাস, হোস্টেল বা স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ে যায়। অনাবিল আনন্দে মন আবিষ্ট হয়ে যায়। কর্মব্যস্ত দিনেও অনুভব করি ছুটির আমেজ।

এরকমই একটি ছোট্ট স্মৃতির কথা লিখতে চাই। বিকেলে আমরা হোস্টেল থেকে বাজারের দিকে একটা দোকানে টিফিন করতে যেতাম। সবাই মিলে আনন্দ করে মুড়ি, চপ বা ঘুগনি-ডিম টোস্ট খেতাম। ওই দোকানেই একটি রঙিন টিভি ছিল। একদিন বিকেলে দেখলাম, রাত্রি সাড়ে নটা থেকে বাজিগর সিনেমা হবে ডিডি ওয়ান চ্যানেলে। তখন শহরুখ খান আমাদের স্বপ্নের নায়ক। ওই সতেরো বছর বয়সে শাহরুখ-কাজল জুটির হাতছানি ছাড়তে পারলাম না। একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম, রাত্রিবেলা সিনেমাটা দেখব। দোকানের মালিকের নামটা ভুলে গেছি। কিন্তু সেই দাদাকে গোপনে বললাম, রাতে আসব। এরপর সংশয়, ভয় আবার খানিকটা রোমাঞ্চকে সাথে করে রাত নটার সময় পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেলাম। গভীর রাতে ফিরলামও পাঁচিল টপকে। হোস্টেলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। হোস্টেল সুপার পাত্রবাবু থেকে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে খবর পৌঁছল। খুব বকলেন। অবশেষে গার্জেন কল হল। বাবা এলেন। আমি খুব অপমানিত হলাম। জীবনে প্রথমবার বাবার জন্য খুব খারাপ লাগল। কারণ, আমার বাবাও একটি স্কুলে প্রধানশিক্ষক ছিলেন। আমার জন্য তাঁর মাথা হেঁট হচ্ছে, এটা মানতে খুব কষ্ট হয়েছিল। একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল। যাওয়ার সময় বাবা বলেছিলেন, স্যারদের উপর আমি যেন কোনও রাগ বা ঘৃণা পোষণ না করি। ওনারা আমার ভাল চান।

বিশ্বাস করুন, সেদিন ওনাদের প্রতি আমার খুব রাগ ও অভিমান ছিল। মনে হয়েছিল, এর জন্য আমাকে শাস্তি দিলেই পারতেন, বাবাকে ডেকে আনার কী দরকার ছিল? একবার সতর্ক করার পরেও যদি একই কাজ করতাম, তখন না হয় ডাকতেন। এই অভিমান, এই প্রশ্ন মনের মধ্যে ছিল। তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। কমলপুর এখন আমার কাছে শুধুই স্মৃতি। আর আমি কমলপুরের হাজার হাজার ছাত্রদের মাঝে হারিয়ে গেছি। কিন্তু আজ যখন দেখি, ফেসবুক মোবাইল, ইন্টারনেট, ট্যাব বা হোয়াটস অ্যাপের যুগে বহু উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ টিন এজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন একথা স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই, সেই তৎকালীন হেডমাস্টারমশাই আমার সঙ্গে সঠিক ব্যবহারই করেছিলেন। আমি আমার মাস্টারমশাইদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ওনাদের এবং কমলপুরের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত। *(ডা. শান্তনু পন্ডা। সার্ভিস লাইন ম্যানেজার, অ্যাপলো গ্লেনিগেলস হসপিটাল)*

ফেসবুকে আলাপন

মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সহজ মাধ্যম হল ফেসবুক। এই ফেসবুকেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপনকে। বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন, রাঢ় আলাপন আপনার হাতের নাগালেই। সার্চ করুন aalaapan bankura এতে আলাপনের বর্তমান সংখ্যা তো পাবেনই। পুরানো সংখ্যাগুলিও দেখতে পারেন। প্রতিটি পাতাই আপলোড করা আছে। এছাড়াও aalaapan bankura group এ ক্লিক করতে পারেন। পিডিএফ ফাইলে আরও সহজে পড়তে পারেন। সেখানেই নিজের মতামত দিতে পারেন। বাঁকুড়া ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন শহর সংক্রান্ত আরও অন্তত পঞ্চাশটি কমিউনিটিতেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপন। সেখান থেকেও পড়তে পারেন।

এর চেয়ে বড় স্বপ্ন যে কখনও দেখিনি

দিব্যেন্দু মুখার্জি

পরিচিত ডাকপিওন হাসিমুখে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চিঠিটা যেদিন দিয়ে যায়— দু'চোখ ভরা কান্নায় ভেসে গিয়েছিলেন আমার বাবা। মনে আছে, দিনটা ছিল ২৩ নভেম্বর, আমার জন্মদিন। আমার মায়ের রান্না করা পায়েসের সঙ্গেও হয়ত মিশে গিয়েছিল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। শুধু সন্তানের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা নয়। চাকরি হয়ত একটা পেয়ে যাব। আমার উপর বাবা-মায়ের এমন বিশ্বাস ছিল। তবু চোখের জল চিঠিতে স্কুলটার নাম দেখে। স্কুলটা যে কমলপুর!

আমার বাড়ি এই স্কুলের অনতিদূরে এমন এক গ্রামে, যেখানে প্রায় সব বাবা-মাই স্বপ্ন দেখেন, ছেলে কমলপুরের মতো স্কুলে শিক্ষক হবে। তার চেয়ে বড় স্বপ্নের কথা জানা ছিল না। আমার কাছে তাই এই স্কুলে শিক্ষকতা এক অর্থে আমার বাবা মায়ের স্বপ্নপূরণেরও ইতিহাস।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী, সহ-প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র মণ্ডল। প্রথমদিন শিক্ষকতুল্য দুর্গাচরণ করবাবু আমার হাত ধরে ক্লাসে দিয়ে এলেন। বাইরে প্রকাশ করি বা নাই করি, ভেতরে ভেতরে একটা চাপা টেনশন ছিল। ক্লাসটা ছিল টেন এ। মনে আছে, বাংলা কবিতার প্রথম সেই ক্লাসে পড়িয়েছিলাম নজরুল ইসলামের ছাত্রদলের গান। তারপর থেকে এই স্কুলের সঙ্গে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

এই স্কুলে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আমার গ্রাম শালডিহা থেকে প্রায় সব বন্ধুরাই আসত কমলপুরে পড়তে। এদেরই একজন বর্তমান শিক্ষক উত্তম দত্ত। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মানসিকভাবে খানিকটা কমলপুরের ছাত্র, স্কুলের খাতায় নাম না থাকলেও। প্রতি সরস্বতী পুজোয় আমি সেভেন কিম্বা এইটের ছাত্রদের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তাম, প্রসাদ নিতে। দুরুদুরু বুক, যদি ধরা পড়ে যাই ! তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র মণ্ডল আমারও মণ্ডলবাবু, সুভাষ পাত্র আমার কাছেও পাত্রবাবু। কিংবা গোবর্ধন মিশ্র আমার কাছেও রাশভারী হেডমাস্টারমশাই।

শিক্ষক হিসেবেও হয়ে গেল অনেকদিন। মনে পড়ে কত অজস্র মুখ। কত না তার উজ্জ্বলতা। কত শান্তশিষ্ট, কত আবার 'বিচ্ছু দ্য গ্রেট'। মনে পড়ে, ক্লাস এইটের একটি ছাত্র পরীক্ষার খাতায় চিঠিতে বন্ধুর নামের জায়গায় লিখেছিল আমার নাম। ঠিকানাটাও আমার ঠিকানা। হাতের লেখাটা হুবহু আমাকেই নকল করে। ক্লাসে অনেক সময় আমরা সিলেবাসের বাইরে অনেককিছু বলে থাকি। অনেক কথার সঙ্গে সহমত নয়, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে, সে কথা লিখে জানিয়েছিল টুয়েলভ সায়েন্সের একটি ছাত্র। মনে পড়ে, মহাদেব, উষ্ণীষ, অচিন্ত্য, মানস কর্মকারেরা পশ্চিমবঙ্গের মেধা তালিকায় জায়গা পেলে দু'হাত তুলে নাচার মতো আনন্দে উদ্বেল হয়েছি। আবার প্রভাত, শ্রীমন্তর অ্যাক্সিডেন্টের পর পোস্ট মর্টেম রুমের সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদেছি।

সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনা। একটি ডাউন সিন্ড্রম বাচ্চা ক্লাস এইটে পড়ে। ক্লাসে সে বিভিন্ন ধরণের গোলমাল করে প্রায়ই। পড়াতে সমস্যা তো হচ্ছিলই, হয়ত অন্য ছাত্রদেরও সমস্যা হচ্ছিল ওকে ঘিরে। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম, ওর বাবা মাকে খবর পাঠানো হবে বাচ্চাটাকে যেন স্কুলে না পাঠান। পরের দিন সেই ছেলে এক টুকরো কাগজ এনে তন্ময়বাবুর হাতে দেয়। ক্লাস মনিটর হিসেবে দুটো নাম লিখে এনেছে। নাম দুটো হল ওর বাবা আর মায়ের। ওদেরকে শাস্তি দিতেই হবে, কেন না ওরা যে প্রতিদিন ওকে স্কুলে আসতে বারণ করেন, এটা কী করে মানা যাবে? কে যেন চাবুক মারে আমাদের পিঠে। তন্ময়বাবু, আশিসবাবু, আমি সকলেই মাথা নিচু করি।

এমন অজস্র ঘটনা আছে, কাউকে নিয়ে হাসপাতালে গেছি, সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবু এই স্কুলের ছাত্র। কেউ হঠাৎ এসে প্রণাম করে বলে, স্যার, চিনতে পারছেন, আমি কমলপুরের ছাত্র। আমারই এই অভিজ্ঞতা, তাহলে প্রবীণ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাটা একবার ভেবে দেখুন। গর্ব করে আমরা বলে থাকি, পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেই যেখানে প্রায় প্রতি ব্যাচে আমাদের একাধিক ছাত্র না আছে। সরকারি বেসরকারি প্রায় সব বড়মাপের হাসপাতালেই হয়ত আমাদের ছাত্র। এমন কোনও বড় মাপের কর্পোরেট হাউস নেই, যেখানে আমাদের ছাত্র নেই। এক সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন সৌজন্য সাক্ষাতে গিয়েছিলাম প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাই গোবর্ধন মিশ্রের মালিয়াড়ার বাড়িতে। বিভিন্ন গল্পের পর শারীরিক কুশলতা প্রসঙ্গে উনি জানালেন, মনোরঞ্জন (প্রখ্যাত চিকিৎসক মনোরঞ্জন মণ্ডল) তো প্রায় প্রতি মাসেই একবার করে দেখে যায়। এক অলৌকিক উজ্জ্বলতা যেন ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। বুক গর্বে বেড়ে ওঠে। আজকের মূল্যবোধহীনতার পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্ত কমলপুর ছাড়া আর কোথায়?

পরবর্তী অংশ ছয়ের পাতায়

নম্বর হারিয়ে যায়, কিন্তু মূল্যবোধটা থেকে যায়

সঞ্জয় মুখার্জি

কমলপুর থেকে কত ডাক্তার হয়েছে, তার কোনও হিসেব আছে? আমার মনে হয়, সংখ্যাটা হাজার ছাপিয়ে যাবে। আর ইঞ্জিনিয়ার? সেই সংখ্যা তো আরও বেশি। আমার কাজের জায়গাটা একেবারেই আলাদা। প্রায় বারো বছর ধরে আমি আছি চায়ের দুনিয়ায়। ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত কেটে যায় চায়ের ভাবনাতেই। আর সারাদিনের এই কাজকর্মের মাঝে কোথাও একটা থেকে যায় কমলপুর।

চা বাগানের ম্যানেজারদের কাজটা বড় অদ্ভুত। চায়ের গাছ লাগানো থেকে করে পরিচর্যা। গুণগত মান থেকে শুরু করে চায়ের নিলাম। এক্সপোর্ট থেকে লেবার ম্যানেজমেন্ট-সবকিছুই সামলাতে হয়। সবার সঙ্গে যেমন মিশতে হয়, তেমনি ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে যেতে হয়। এই মেলামেশা আর নিয়মনিষ্ঠা দুটো আসল শিক্ষাই পেয়েছি কমলপুর থেকে। কমলপুর না গেলে হয়ত বিরাট বড় একটা ফাঁক থেকে যেত।

এককেকটা বাগানে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার শ্রমিক কাজ করেন। কার বউ অন্যের সঙ্গে পালিয়েছে, কার স্বামী রাতে মদ খেয়ে বুকে পিটিয়েছে, কার ছেলের লেখাপড়া হচ্ছে না, কার কী রোগ হয়েছে, এমন হাজার সমস্যা সামলাতে হয় ম্যানেজারদেরই। ওখানে থানা পুলিশের কাছে যাওয়ার তেমন রেওয়াজ নেই। আগে সবাই হাজির হয় ম্যানেজারের কাছে। পুলিশও কিছু হলে আগে আমাদের জিজ্ঞেস করে। পুলিশের প্রায় আশি ভাগ কাজ আমরাই সামলে দিই। পাহাড়ি অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে নানা ব্যাপারে প্রশাসন আমাদের উপরই নির্ভর করে। তাই আমরা যখন খুশি এসপি বা ডিএমদের সঙ্গে দেখা করতে পারি। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হইনি বলে পরিচিতরা হয়ত অনেকে আক্ষেপ করেন। তাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কি যখন তখন ডিএম বা এসপি-র সঙ্গে দেখা করতে পারেন?

স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই, এই শৃঙ্খলা পেয়েছি কমলপুর থেকেই। সব স্কুলে বা হোস্টেলেই হয়ত কিছু শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু কমলপুর সবার থেকে আলাদা। দু একটি বিষয় বললেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের সময়ে উচ্চ মাধ্যমিকের সেন্টার পড়ত বাঁকুড়ায়। স্কুল থেকে আলাদা বাস করা হত। সেই বাসে মাস্টারমশাইরাও সঙ্গে যেতেন। পরীক্ষার পর সেই রাতেই আবার ঝালিয়ে নেওয়া। সন্ধে ছটা থেকে হত স্পেশাল ক্লাস। পরেরদিন যে বিষয়টা আছে, সেই বিষয়ের মাস্টারমশাই ক্লাস নিতেন। শেষ পর্বের প্রস্তুতিতেও সরাসরি জড়িয়ে থাকতেন মাস্টারমশাইরা। অন্য সব স্কুলেই গরমের সময় আর পুজোর সময় লম্বা ছুটি থাকত। ব্যতিক্রম কমলপুর। সেখানে এই দুই ছুটিতেও ক্লাস হত। স্যাররা নিজেদের তাগিদে এই ক্লাস করাতেন। এমনটা আর কটা স্কুলে হয়?

শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তখন শুধু চোখ বুজে কমলপুরের কথা ভাবি। প্রচলিত নিয়মের বাইরে যেন অন্য এক পৃথিবী। হ্যাঁ, আমি সেই স্কুলের ছাত্র। কে কত নম্বর পেল, সেটাই একমাত্র মানদন্ড নয়। সেই নম্বর লোকে ভুলে যায়। যেটা থেকে যায়, তা হল মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধটা যেন আজীবন ধরে রাখতে পারি।

(লেখক গুডরিকের মার্গারেট' হোপ চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার)

ওই একটি কথা, জীবনের টার্নিং পয়েন্ট

শুভেন্দু মণ্ডল

ছোটবেলাটা হল স্লেটের মতো। অনেককিছু লেখা যায়, আবার মুছেও যায়। ঘটনাবহুল এই জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটে। কিন্তু কিছু ঘটনা এমন রেখাপাত করে যায়, যার অভিঘাত থেকেই যায়। এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার মর্ম তখন হয়ত বুঝতে পারা যায় না। বয়স বাড়লে একটু একটু করে বোঝা যায়। কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলকে ঘিরে আমারও স্মৃতির অভাব নেই। ভুলে যাওয়ার বয়সও হয়নি। একটু চেষ্টা করলেই টুকরো টুকরো অনেক কথা মনে পড়ে যায়। তখনকার ঘটনা এখনকার চোখ দিয়ে দেখতে ভালই লাগে।

আমি একজন স্কুলশিক্ষক। বাছাই করা কৃতীদের তালিকায় আমার নাম পাবেন না। তবু আমারও যে অনেক স্মৃতি জমে আছে। সব লিখতে গেলে সে এক আস্ত উপন্যাস হয়ে যেতে পারে। আমি বরং দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

প্রথমটি ক্লাস সিক্সের। যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমি স্থানীয় ছেলে। মাস্টারমশাইরাও অনেকেই স্থানীয়। অনেকেই আমার বাবাকে চিনতেন। কেউ কেউ বাবার সূত্র ধরে আমাকে চিনতেন। তাঁরা নাম নয়, পদবী ধরে ডাকতেন। আবার কেউ কেউ বাবাকে চিনতেন না, আমাকেই চিনতেন, তাঁরা ডাকতেন নাম ধরে। যাঁরা আমাকে চিনতেন, সেটাও কিন্তু ভাল পড়াশোনার জন্য নয়, বরং পড়াশোনা না করার জন্য। ওই সময় যা হয়! পড়াশনার থেকে খেলাধুলাতেই মন বেশি। মন উড়ু উড়ু। ফলে খুব নিয়ম মেনে পড়াশোনা হত না। সিক্সের পরীক্ষায় দেখা গেল, আমি চার নম্বর কম পেয়েছি। অন্য স্কুলে কড়াকড়ি না করে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কমলপুরে তা ছিল না। ফলে, বন্ধুরা সেভেনে উঠে গেলেও আমাকে সিক্সেই থেকে যেতে হল। প্রথম ক্লাস। ক্লাসে ঢুকছেন হাবু বাবু। উনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হলেও নিচু ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন। ক্লাসে ঢুকে তখনও চেয়ারে বসেননি। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মণ্ডল, কী ব্যাপার?' আমি কী আর বলব? মাথা নিচু করে আছি। এমন সময় তিনি ফের বললেন, 'তোর বাবা শিক্ষক, তুই ফেল করলি!' খুবই সাধারণভাবে কথাটা বললেন। তারপর বললেন, 'দেখি, কে কে পুরনো পাপী আছিস? উঠে দাঁড়া।' আরও কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। তারপর উনি পড়ায় ঢুকে গেলেন। আর কী কী বলেছিলেন, মনে নেই। কিন্তু একটা কথা মাথার মধ্যে সবসময় ঘুরঘুর করতে লাগল, 'তোর বাবা শিক্ষক, তুই ফেল করলি!'

না, স্যারের উপর একটুও রাগ হয়নি। একটা নির্মম সত্যি সেদিন তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যাদের বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই, যারা এত কষ্ট করে বড় হচ্ছে, তারা ফেল করলে তবু একটা যুক্তি আছে। কিন্তু আমার বাবা শিক্ষক, আমি ফেল করব কেন? সেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিলাম, আর যেন কখনও এমন কথা শুনতে না হয়। পরের বছর বেশ ভাল রেজাল্ট হল। বি থেকে এ সেকশনে। তারপর থেকে মোটামুটি এক থেকে দশের মধ্যেই রোল নম্বর থাকত। অনার্স, এম এ, বি এড— সবসময় মাথার মধ্যে কথাটা ঘুরঘুর করত, 'তোর বাবা শিক্ষক, তুই ফেল করলি!'

আজ আমিও একজন শিক্ষক। কাকতালীয়ভাবে, আমারও পড়ানোর বিষয় ইতিহাস। পেশার সূত্রে থাকি উত্তরবঙ্গে। কমলপুরের গেলে মাঝে মাঝেই হাবু বাবুর সঙ্গে দেখা হয়, প্রণাম করি। স্যার হয়ত কথাগুলো ভুলে গিয়েছেন। ক্লাস সিক্সের ওই একটা কথা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আজ আমি আমার ছাত্রদের ওই কথা বলতে পারি না। কারণ, পাস ফেল প্রথাটাই উঠে গেছে। মাঝে মাঝে ভাবি, যদি পাস ফেল থাকত, আমিও বোধ হয় আমার ছাত্রদের সেরকমই কিছু একটা বলতাম। হয়ত তার সাময়িক খারাপ লাগত। কে বলতে পারে, হয়ত তার জীবনেও মোড় ঘুরে যেত।

(লেখক শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক)

ধন্যবাদ ফেসবুক, সবাইকে আবার মিলিয়ে দিলে!

সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি

কফিহাউসের সেই গানটার কথা মনে পড়ে। একসঙ্গে আড্ডা দেওয়া মানুষগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তখন যদি ফেসবুক থাকত, তাহলে সুজাতার সঙ্গে মঈদুলের বা নিখিলেশের সঙ্গে অমলের ঠিক যোগাযোগ থাকত। আমাদের বন্ধুরাও একেকজন একেকদিকে চলে গেল! কে যে কোথায় হারিয়ে গেল! সবাইকে না হোক, অনেককেই আবার খুঁজে পেয়েছি। সৌজন্যে ফেসবুক।

না, লেখার বিষয় ফেসবুক নয়। লেখার বিষয় হল কমলপুর নেতাজি হাইস্কুল। আমি ভর্তি হয়েছিলাম ইলেভেনে (১৯৯৫-৯৭)। তখন কতই বা বয়স! সবকিছু বোঝার মতো বুদ্ধি তখনও আসেনি। সেদিনের অনেক ঘটনাই তখন বুঝিনি। আজ ঠান্ডা মাথায় ভাবতে গেলে, বুঝতে পারি।

একটা ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ার আগে থেকেই তৈরি থাকতেন স্যারেরা। এক মাস্টার মশাই বেরোনোর আগেই অন্য মাস্টার মশাই দাঁড়িয়ে থাকতেন। অনেক সময় একই স্যারের হয়ত পরপর দুটো ক্লাস। একটা ক্লাস সেরে, কমনরুমে না গিয়েই ঢুকে পড়লেন অন্য ক্লাসে। এমনটা আর কোনও স্কুলে হয় বলে শুনিনি। তখন মনে হত, স্যাররা একটু দেরিতে এলেই ভাল হত। একটু গল্প করার সময় পাওয়া যেত। তখনকার বিচার-বুদ্ধিতে হয়ত এটা ভাবাই স্বাভাবিক ছিল।

বুঝলাম, দেশের বাইরে গিয়ে। কর্মসূত্রে তিন বছর কেনিয়া ও ৬ মাস দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর বিশ্বব্যাঙ্কের প্রোজেক্ট। তখন বুঝতে পারি, পাঙ্কচুয়ালিটি কাকে বলে। আজকের কাজ সাতদিন পরে নয়, বরং সাতদিন পরের কাজটা আগাম আজকে তুলে রাখা। সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা। তখন মনে পড়ত সেই স্যারদের কথা। মনে হল, এ দেশে এসে তো নতুন করে দেখছি না। এই পাঙ্কচুয়ালিটির পাঠ তো সেই স্কুলেই শেখানো হয়েছিল। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এসবের পাশাপাশি এই শিক্ষাটা নিজের অজান্তেই কখন যে ঢুকে পড়েছিল!

(লেখক সরকারি গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত)

ভাগ্যিস ফিরে আসিনি

ডা. কার্তিক ঘোষ

জীবনে একটা মস্তবড় ভুল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, একসময় আমি কমলপুর ছেড়ে চলে আসতে চেয়েছিলাম। আজ দুই দশক পর যখন পুরানো ঘটনাগুলো মনে পড়ে, তখন মনে মনে বারবার একটা কথাই বলি, ভাগ্যিস সেদিন ফিরে আসিনি।

নতুন যাওয়া সবার সঙ্গেই বোধহয় এমনটা হয়। বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়। আসলে, ক্লাস টেন পর্যন্ত বাড়ি থেকেই স্কুল করেছি। ইলেভেনে সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ। জেলার এমনকি পাশের জেলার নানা প্রান্ত থেকে সেরা ছাত্ররা ভর্তি হয়েছে। সবাই নিজের নিজের স্কুলের ফার্স্ট বয়। অনেক নম্বর পেয়ে সবাই এসেছে। শুরু থেকেই যেন একটা কম্পিটিশন। সবাই সবার প্রতিযোগী।

সবাই পড়াশোনা করবে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু শুরু থেকেই যদি প্রতিযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিক বন্ধুত্বটাও ঠিক গড়ে ওঠে না। একে বাড়ি ছেড়ে থাকা, তার ওপর যাদের সঙ্গে থাকছি, তারা যদি সবসময় নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশন করে, তখন মন-খারাপটা আরও বেড়ে যায়। আমি গ্রামের ছেলে। সহজ সরল খোলামেলা পরিবেশে বড় হয়েছি। তাই হয়ত মানিয়ে নিতে আরও বেশি সমস্যা হচ্ছিল। এক সময় ঠিক করলাম, চলে যাব। নিজের পুরনো স্কুলেই ফিরে যাব। সেখানে অন্তত প্রতিনিয়ত চাপ থাকবে না, খোলা মনে পড়াশোনা করা যাবে।

কিন্তু পারলাম না। মনে পড়ছে আমার পুরনো স্কুল ছাতনা চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠের মাস্টারমশাই সুভাষচন্দ্র দে-র কথা। তাঁর উৎসাহেই কমলপুরে ভর্তি হওয়া। তিনি সব সমস্যা শুনলেন। তারপর বললেন, 'যে কারণে গেছো, সেটা তো হচ্ছে। বাকিরা তো পড়াশোনাই করছে। তাহলে সমস্যা কোথায়? পড়াশোনাটা যখন হচ্ছে, তখন বাকি ছোটখাটো সমস্যাগুলো মানিয়ে নাও। পারবে না?' আর ফিরে আসা হল না। কমলপুরেই থেকে গেলাম।

নিজের মনকে আরও শক্ত করে নিজেই নিজেকে বললাম, 'আমাকে এখানেই থাকতে হবে। কষ্ট হলেও থাকতে হবে।' পরেরদিকে অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসে। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব তৈরি হয়। কমলপুর বলতেই মনে পড়ে যায় পাত্রবাবুর কথা। বিরল এক মানুষ। এত কঠিন বিষয়কে এত সহজ করে বলতেন, মনে হত বিষয়টি সত্যিই বোধহয় খুব সহজ। আসলে, পাত্রবাবু শুধু শিক্ষক নন, তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক। শুধু আমার নন, আরও অনেকের অভিভাবক। কোন ছাত্রর কোথায় সমস্যা, কার বাড়ির আর্থিক অবস্থা কী, কার মন খারাপ, সবকিছু খোঁজ রাখতেন। সমস্যার কথা মুখ ফুটে তাঁকে বলতেও হত না। একটা সংবেদনশীল মন ছিল বলে সবকিছুই বুঝতে পারতেন। অনেকে তাঁকে ভয় পেত। শুরুর দিকে আমার মধ্যেও হয়ত কিছুটা ভয় ছিল। কিন্তু পরে বুঝলাম, ভয় নয়, এই মানুষটাকে ভরসা করা যায়। এই মানুষটা একটা বটগাছের মতো, যার তলায় পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেওয়া যায়।

> কমলপুর বলতেই মনে পড়ে যায় পাত্রবাবুর কথা। বিরল এক মানুষ। এত কঠিন বিষয়কে এত সহজ করে বলতেন, মনে হত বিষয়টি সত্যিই বোধহয় খুব সহজ। আসলে, পাত্রবাবু শুধু শিক্ষক নন, তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক। শুধু আমার নন, আরও অনেকের অভিভাবক। কোন ছাত্রর কোথায় সমস্যা, কার বাড়ির আর্থিক অবস্থা কী, কার মন খারাপ, সবকিছু খোঁজ রাখতেন।

(লেখক একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজে কর্মরত)

এর চেয়ে বড় স্বপ্ন যে কখনও দেখিনি

চতুর্থ পাতার পর

স্কুলের বর্ষীয়াণ শিক্ষক যাঁরা, তাঁদের অনেকেই অবসর নিয়েছেন কালের নিয়মে। কেউ বা ইহলোকে নেই। এদের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক ভালবাসা আর অবাধ প্রশ্রয়। দেখে অবাক হতাম, প্রত্যেকটি ছাত্রকে নামে চিনতেন। এবং তাদের পড়াশোনার খুটিনাটি নজর রাখতেন চিত্ত দেওঘুরিয়াবাবু। পৌরাণিক সাহিত্য নিয়ে তাঁর কৌতুহলকে তো আমি রীতিমতো ভয় পেতাম। দুগাই কুণ্ডুবাবুর সন্তানস্নেহে প্রশ্রয়কে ভুলব না কখনও। আর হোস্টেল সুপার পাত্রবাবু! বহু ছাত্রের পিঠে ভেঙেছে করবীর গুচ্ছ গুচ্ছ বেত। আর তাই নিয়ে পরদিন অনিবার্য দাম্পত্য কলহের গল্প। কমলপুরের স্কুলের কোনায় কোনায় কান পাতলে আজও শোনা যায়। সুভাষ মণ্ডলবাবু, দুর্বোধ্যতার সব মধ্যমাই যাঁর মন্ত্রে সমাধানের সহজ সমবিন্দুতে অনায়াসে মিশে যায়। সুজিতদা, ভবতোষদা, অজিতদা—কত না গুণীজনের পদধূলী মিশে আছে এই স্কুলের মাটিতে। আমরা বর্তমান প্রজন্ম এঁদের পান্ডিত্যের যোগ্য নই। তবে স্কুলকে ভালবাসার দীক্ষা তো পেয়েছি তাঁদের কাছেই। তাই আমাদেরও স্পর্ধা আকাশচুম্বী। স্কুলের গৌরব রক্ষা করার প্রতিজ্ঞায় আমাদেরও হাত মুষ্টিবদ্ধ। আমাদের মায়ের বয়সও তো ষাট বছরেরই কাছাকাছি।

(লেখক কমলপুর নেতাজি হাইস্কুলের বর্তমান শিক্ষক)

কমলপুরে আই টি সেক্টর!

স্বরূপ গোস্বামী

সবাই যখন ঘুমিয়ে ওঠে, তিনি তখন গুমোতে যান। মাঝদুপুরে সবাই যখন অফিসে বা স্কুলে চূড়ান্ত ব্যস্ত, ঘড়ির কাঁটা যখন আড়াইটে বা তিনটে, সেই সময় তাঁর ঘুম ভাঙে। অনেকের যখন লাঞ্চ সারা হয়ে যায়, তখন তিনি মুখ ধুয়ে 'সকালের চা' নিয়ে বসেন। একদিন, দুদিন নয়, মোটামুটি এটাই তাঁর রোজকার রুটিন।

আমরা সবাই যখন এ দেশের সময় মেনে ওঠা-বসা করি, তখন তাঁকে চলতে হয় আমেরিকা আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। মুম্বই, পুনে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই বা হায়দরাবাদ বা কলকাতার আই টি সেক্টরের ছেলেদের কাছে রুটিনটা অচেনা নয়। কিন্তু কমলপুরের মতো জায়গায় যদি কেউ এই রুটিন মেনে চলেন, কিছুটা অবাক হতেই হয়। আরও বেশি অবাক হতে হয় তাঁর কর্মকান্ড শুনে। ইতিমধ্যেই দুঃসাহসিক এক কাজ করে বসে আছেন কমলপুরের এই তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। কমলপুরের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় যেন গড়ে উঠেছে আইটি সেক্টর। বিশ্বের নানা দেশের সঙ্গে আউটসোর্সিং চলছে এই কমলপুরে বসেই। এক অসাধ্য সাধন করে চলেছেন সুমন্ত মণ্ডল। তাঁর এই দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হয়েছেন আরও কয়েকজন।

সুমন্তর কাজকর্মে ঢোকার আগে তাঁর সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। জন্ম কমলপুরে। ক্লাস সিক্স থেকে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন। ইলেভেন, টুয়েলভ কমলপুর নেতাজি হাইস্কুল থেকে। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং, বিষয় তথ্যপ্রযুক্তি। বেঙ্গালুরুতে ভাল একটা কোম্পানিতে বেশ দায়িত্বশীল জায়গাতেই ছিলেন। বছর চারেক চুটিয়ে কাজ করলেন। চাকরি করতে করতেই মাথায় এল একটা পরিকল্পনা, এখানে বসে যা করছি, তা তো কমলপুর থেকেই সম্ভব। অনেক ছেলের কর্মসংস্থান হতে পারে।

কথাটা বললেন বাবা সুভাষচন্দ্র মণ্ডলকে। তিনিও উৎসাহিত করলেন ছেলেকে। কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না? কমলপুরের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক তখন এক গর্বিত বাবা, 'ওর উপর বরাবরই একটা আস্থা ছিল। ওর কাজের জগতটা আমার থেকে ও-ই ভাল বুঝবে। ওর যখন মনে হল, এখানে এসে নতুন কিছু করা যায়, তখন আমি বাধা দেব কেন? গতানুগতিক চাকরি তো সবাই করে। ও এই কমলপুরে বসে এমন একটা কাজ করছে, যা এই মফস্সলে বসে ভাবাই যায় না। আমারও মনে হল, এই চ্যালেঞ্জটা ওর নেওয়া উচিত।'

নিশ্চিত চাকরির মোহ ছেড়ে এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে ভয় করেনি? দুপুরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুমন্ত বললেন, 'সমস্যা ভাবলেই সমস্যা। ভয় পেয়ে গেলে তো কোনও কাজই করা যাবে না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম সম্ভাবনার দিকটা। যেটা ব্যাঙ্গালোরে বসে করছিলাম, ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে আর কিছু যোগ্য ছেলে থাকলে তা এখান থেকেই সম্ভব। আজ আমি ঝুঁকি নিয়েছি, কাল হয়ত অন্যরা নেবে। আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের কথায় কথায় কেন বাইরে ছুটতে হবে?'

তাঁর কাজের দিকটা অনেকটাই টেকনিক্যাল। সবার পক্ষে বোঝা কঠিন। মূল কাজ হল বেশ কিছু বিদেশি পণ্য ও ওয়েবসাইটকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রোমোট করা। কাজটা হল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। সার্চ টুয়েন্টি ফোর অনলাইন ডট কম। একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। কেউ কি জানেন, এই ওয়েবসাইটের কর্ণধার বত্রিশ বছরের এই কৃতী ইঞ্জিনিয়ার? ভাবতে পারেন, এই ওয়েবসাইটের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা হয় এই কমলপুর থেকে? সুমন্তর কথায়, 'একটা ভাল প্রোডাক্টের জন্য দরকার মার্কেটিং। কত তাড়াতাড়ি এবং কত কম খরচে তা মানুষের কাছে তুলে ধরা যায়, কোন ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে, সেই পৌঁছনোর মাধ্যম কী, এগুলো নিয়ে রিসার্চ করা খুব জরুরি। সেই কোম্পানির একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি থেকে শুরু করে দ্রুত সেই প্রোডাক্টকে মানুষের সামনে আনা। সেই কাজটাই আমরা করে থাকি।'

আর সেই কাজ করতে গিয়েই খোঁজ রাখতে হয় সারা পৃথিবীর ওঠাপড়ার সঙ্গে। আমরা যখন শীতের রাতে চরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকি, কমলপুরের ওই আই টি সেক্টর তখন জেগে থাকে। রাত ফিকে হয়ে আসে। সুমন্তর চোখে তখন নতুন সূর্যোদয়ের বার্তা।

ছাত্ররাই আমাদের তৈরি করে

*শুরু ডেপুটেশনের শিক্ষক হিসেবে। সেখান থেকে প্রধানশিক্ষক। আরও নানা ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে। স্মৃতির সরণি বেয়ে হাঁটলেন **সুভাষচন্দ্র মণ্ডল**। শুনে এলেন **অভিজিৎ দে**।*

প্রায় চল্লিশ বছর জড়িয়ে থাকলে যা হয়! একসঙ্গে অনেক স্মৃতি এসে ভিড় করে। কত চেনা মুখ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবছা হয়ে যাওয়া কত মুখ। কোনও ছাত্রের শুধু নামটুকু মনে আছে। আবার কারও মুখটা মনে পড়লেও নামটা কিছুতেই মনে পড়তে চায় না। কারও সঙ্গে দেখা হলে তার বর্তমান চেহারাটা মেনে নিতে পারি না। হোমড়া চোমড়া ভুড়িওয়ালা কেউ হয়ত এসে বলল আমি আপনার ছাত্র। নাম ধাম বলার পর সেই পুরানো মুখটাই বেশি করে মনে পড়ে। অনেকে ফোন করে। এখনকার চেহারার বদলে তখনকার চেহারাটাই বেশি করে ভেসে ওঠে।

যাঁরা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন, তাঁদের সবার অভিজ্ঞতা কম বেশি আমার মতোই। অনেকেই পুরানো ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হয়ত ঠিকমতো চিনতে পারেন না। কমলপুরের মতো স্কুল হলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। কারণ, এখানে ইলেভেন-টুয়েলভে অধিকাংশ ছাত্রই তো বাইরে থেকে আসে। পাস করার পর আরও দূরে চলে যায়। চাকরিসূত্রে দেশের নানা প্রান্তে, এমনকি বিদেশেও চলে যায়। আর কখনও দেখাই হয় না। আমাদের চেহারায় তেমন বদল আসেনি। তিরিশ বছর আগে যেমন ছিলাম, এখনও প্রায় তেমনই আছি। ছাত্ররা ঠিক চিনতে পারে। কিন্তু আমাদের হয়ে যায় সমস্যা। একে বয়স বাড়লে স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে। তার উপর তার চেহারার আমূল পরিবর্তন।

আমার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা আরও বেশি হয়। কারণ, প্রথম দেখায় সে কোথাকার ছাত্র, সেটাই অনেক সময় গুলিয়ে যায়। আসলে, কমলপুরের সাথে সাথে বারো বছর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনেও পড়িয়েছি। আমার ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ত। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে আলাপ। হঠাৎ স্কুলে একদিন মহারাজরা হাজির। তাঁরা বললেন, 'আমরা এবার থেকে হায়ার সেকেন্ডারি চালু করছি। আমাদের সিনিয়র টিচাররা অনেকদিন হায়ার সেকেন্ডারির চর্চার মধ্যে নেই। আপনাকে অঙ্কের দায়িত্ব নিতে হবে।' কিন্তু আমি সময় বের করব কীভাবে? ওনারাই সমাধানসূত্র বলে দিলেন, 'শনিবার স্কুল ছুটির পর যাবেন। রাতে একটা ক্লাস নেবেন। রাতে ওখানেই থাকবেন। রবিবার সকালে পড়িয়ে বিকেল নাগাদ ফিরে আসবেন।'

একে স্কুলের চাপ। তার পর শনি, রবির এই বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া মানে আরও চাপ বেড়ে যাওয়া। আবার মনে হল, রামকৃষ্ণমিশন মানে এমন উজ্জ্বল সব ছাত্রকে পড়ানোর সুযোগ। এই কৃতী ছাত্রদের পড়ালে নিজেও কিছুটা সমৃদ্ধ হতে পারব। এই ভেবেই রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া। টানা বারো বছর পড়িয়েছি। সেখানকার ছাত্ররাও নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সেই কারণেই এই বিভ্রান্তি। যখন কেউ এসে প্রণাম করে, তখন আগে বুঝতে হয়, সে কমলপুরের ছাত্র না রামকৃষ্ণ মিশনের। শিক্ষক জীবনের এটাই পরম সৌভাগ্য, গর্ব করার মতো হাজার হাজার ছাত্র পেয়েছি। এই ছেলেদেরকে পড়াতে হলে নিজেকেও অনেক তৈরি থাকতে হয়। অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয়। এমন এমন প্রশ্ন আসে, যা আমি হয়ত ভাবতেও পারিনি। অনেকে বলে, আমরা নাকি ছাত্রদের তৈরি করি। কিন্তু ঘটনা হল, ছাত্ররাই আমাদের তৈরি করে।

কমলপুরে আমার ভূমিকাটা বড় অদ্ভুত। ১৯৬৮ নাগাদ ঢুকেছিলাম ডেপুটেশনে। কিন্তু তার পর থেকে এতরকম ভূমিকায় থেকেছি, কার কেউ একসঙ্গে এতগুলো ভূমিকায় ছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। অন্তত আমার জানাশোনা কেউ নেই। ঢুকেছিলাম ডেপুটেশনে। সেখান থেকে হলাম স্থায়ী শিক্ষক। আমার বাড়ি কমলপুর থেকে অনেক দূরে। ফলে, শুরুর দিন থেকেই হোস্টেলেই থাকতে হত। আমাকে করে দেওয়া হল হোস্টেল সুপার। ১৯৬৮ থেকে টানা পনেরো বছর ছিলাম এই দায়িত্বে। এরই মাঝে

১৯৭৪ থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন চালু হল। তখন আমাদের স্কুলে কোনও খেলার মাস্টারমশাই ছিলেন না। আমাকেই পাঠানো হল কল্যাণীতে, শর্ট কোর্স করতে। ফিরে এসে অঙ্কের টিচার, হোস্টেল সুপারের পাশাপাশি গেমস টিচার। একাশি সালে এলাম ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে। তারপর হলাম স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি। এবার অ্যাসিস্ট্যন্ট হেডমাস্টার। সেখান থেকে টিচার ইনচার্জ। তারপর হলাম হেডমাস্টার, পোস্টিং সেই কমলপুর স্কুলেই। এই কারণেই বলছিলাম, স্কুলের এতরকম দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, যা আর কাউকে করতে হয়নি।

পড়ানোর পাশাপাশি প্রশাসনের দায়িত্ব। খুব একটা সমস্যা হয়নি। কারণ অনেকদিন ধরে এখানেই আছি। শিক্ষকরা অনেকেই আমার ছাত্র। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাও আমার ছাত্র। বাকিদের সঙ্গেও দীর্ঘদিন কাজ করছি। ফলে, সবার পাল্‌সটা বুঝতাম। কাকে কোন কাজটা দিতে হবে, কাকে দিয়ে কোন কাজটা হবে, একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। সেই কারণে কাজ করতে সমস্যা হয়নি। ছোটখাটো সমস্যা এসেছে। সবাই পাশে ছিল, তাই সামলে নিয়েছি। সেই সময়েই দুটি বড় কাজ হয়েছিল। তপসিলি জাতি, উপজাতি ছাত্রদের জন্য বিশেষ অনুদান আনা সম্ভব হয়েছিল। পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তপসিলি জাতি, উপজাতি ও দুস্থ মহিলাদের জন্য একটি আলাদা হোস্টেল। সেটা অবশ্য এখনও চলছে।

যখন এসেছিলাম, তখন কমলপুর ছিল পাণ্ডববর্জিত জায়গা। আর আজ এক বর্ধিষ্ণু জনপদ। চোখের সামনে একটু একটু করে বেড়ে উঠতে দেখলাম কমলপুরকে। আরও বেড়ে উঠুক। এর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

ANNEXURE.A

OFFICE OF THE ARRAH GRAM PANCHAYAT

ARRAH :: BANKURA

NIT No.-04/2014-15 **DATED:- 20.01.2015**

Sl no	Name of the work	Fund	Estimated amount put to tender (Rs.)	Earnest money (Rs)	Cost of tender form (Rs.)	Time for completion
1	Construction of a Drain at Arrah Mondalpara from the house of Ganesh Mondal to Tubewell	3rd SFC.	61,849.00	1237.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.
2	Construction of remaining part of SGSY Shed at Kanki Roypara		117,590.00	2352.00	250.00	45 (Forty five) days from the date of issuing W.O.
3	Construction of SGSY Shed at Banagram Bauripara		128,907.00	2578.00	250.00	45 (Forty five) days from the date of issuing W.O.
4	Construction of concrete road at Murgaboni from the house of Nimai Rakshit to the house of Shyam Rakshit (70mtr.)		144,375.00	2888.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.
5	Construction of concrete road at Bindajam Dealerpara from dealer shop to main road		113,840.00	2277.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.
6	Construction of concrete road Malpara from the house of Bhairab Bauri to the house of Sanjoy Bauri		148,500.00	2970.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.
7	Construction of concrete road from Chhoto amdiha to the house of Tarapada Bauri		127,041.00	2541.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.
8	Construction of SGSY Shed at Parashibona (phase-II)	13th CFC.	128,907.00	2578.00	250.00	45 (Forty five) days from the date of issuing W.O.
9	Construction of concrete road at Bindajam Karapara from the house of Ramchand Hansda to Kanka Goria		99,000.00	1980.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.
10	Construction of concrete road at Barabanagram from the house of Sahadeb Majhi to Mansamandir		74,251.00	1485.00	250.00	20 (Twenty) days from the date of issuing W.O.

IMPORTANT DATES	DATE	TIME
Date & time of Application	05.02.15	11am to 3 pm
Date& time of issue of tender form	06.02.15	11am to 3 pm
Last Date& time of recived of tender paper	10.02.15	11am to 1.30 pm
Date & time of Opening:	10.02.15	at 2.00 pm

For any other enquiry please contact to the undersigned.

Pradhan
Arrah Gram Panchayat

একান্ত সাক্ষাৎকারে গোবর্ধন মিশ্র

ছাত্রদের মাঝেই তো আমরা বেঁচে থাকি

*কমলপুর মানেই কমলপুর নেতাজি হাইস্কুল। আর হাইস্কুল মানেই সবার আগে ভেসে ওঠে তাঁর মুখ। তিল তিল করে যিনি কমলপুরকে তুলে এনেছেন খ্যাতির শীর্ষে। অবসরের বাইশ বছর পরেও তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা মুখেমুখে প্রবাদ হয়ে ফেরে। বন্ধুপ্রতিম রাজেশ চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে একদিন পৌঁছে গেলাম তাঁর মালিয়াড়ার বাড়িতে। একেবারে অন্য মেজাজে পাওয়া গেল **প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গোবর্ধন মিশ্রকে**। দুপুর থেকে কথায় কথায় নেমে এল সন্ধে। সেই কথার নির্যাস তুলে ধরলেন **স্বরূপ গোস্বামী**।*

প্রশ্ন: আপনার পড়াশোনা তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতাতে শিক্ষকতাও করতেন। সেখান থেকে হঠাৎ কমলপুরে আসতে ইচ্ছে হল?

গোবর্ধন মিশ্র: শুরুতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। এখান থেকে যখন ডাক পেলাম, তখন আদৌ এখানে থাকতে পারব কিনা, তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই ওখান থেকে রিজাইন করিনি। সবকিছু নিয়েও আসিনি। একমাসের ছুটি নিয়েই এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, ভাল না লাগলে ফিরে যাব। কিন্তু কেন জানি না, পরিবেশটা ভাল লেগে গেল। মনে হল, এখানেই থেকে যাই।

প্রশ্ন: ওখানে থাকলে নানা রকম সুযোগ ছিল। নামী কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। সেই হাতছানি ছেড়ে জনমানবহীন গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারি? নিজেকে উদ্দীপ্ত করলেন কীভাবে?

গোবর্ধন মিশ্র: মনে হয়েছিল, বিশাল মহানগরে আমি এক নগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু এই গ্রামের স্কুলে অনেককিছু করার সুযোগ আছে। নতুন করে স্কুলটাকে গড়ে তোলা যাবে। তাই মনে হল, চ্যালেঞ্জটা নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন: আপনি কলকাতা থেকে আসা উচ্চশিক্ষিত মানুষ। গ্রামের পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি?

গোবর্ধন মিশ্র: কলকাতায় পড়াশোনা করলেও আমার আসল বাড়ি মালিয়াড়ায়। তাই সে অর্থে দেখলে আমিও গ্রামের মানুষ। যখন প্রথম আসি, গোটা কমলপুরে একটা মাত্র দোকান ছিল। আশেপাশে কোনও বাড়িও ছিল না। অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে ছিল স্কুলটা। তখন মাটির বাড়ি। আমার জন্যও বরাদ্দ হয়েছিল ছোট্ট একটা মাটির ঘর। সন্ধের পর থেকে একেবারে নিঝুম। কিছুটা দূরে গ্রামে বসতি ছিল। তাঁরা মাঝে মাঝেই এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন।

প্রশ্ন: আপনার শিক্ষকজীবনের পুরো সময়টা তো হোস্টেলেই কেটে গেল। আলাদা করে বাড়ি করার কথা মাথায় আসেনি?

গোবর্ধন মিশ্র: ছেলেদের মাঝে ভালই তো ছিলাম। অনেক মাস্টারমশাইরাও থাকতেন। মণ্ডলবাবু থাকতেন, পাত্রবাবু থাকতেন। এখানেও আমরা পরিবারের মতোই থাকতাম। অনেক কষ্ট ছিল। কিন্তু একসঙ্গে থাকার একটা আনন্দও ছিল। কেউ কেউ রান্না করে আনতেন। তাঁদের বলতাম, আমাকে মাছ খাওয়াবেন, আর আমার ছেলেরা কুমড়োর তরকারি খেয়ে থাকবে? এটা কি ভাল দেখায়? তখন তাঁরা আমার জন্য আনলে ছাত্রদের জন্যও মাছ নিয়ে আসতেন।

প্রশ্ন: শুরু থেকেই কি কড়া হাতে হাল ধরেছিলেন? খোলনলচে বদলে ফেলেছিলেন?

> আমার জীবনের বিরাট অংশজুড়ে কমলপুর। সেদিনও ছিল, আজও আছে। অনেক ছাত্রর সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে। মনোরঞ্জন মণ্ডল তো প্রায়ই দেখে যায়। আমাকে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়ে আনল। আমাদের ছাত্ররাই মাথা উঁচু করে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। একজন শিক্ষকের কাছে এর থেকে গর্বের আর কী হতে পারে!

গোবর্ধন মিশ্র: না, তেমনটা করতে হয়নি। কারণ, আমি আসার আগে থেকেই সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল। আমার কাজ ছিল একটা কঠোর শৃঙ্খলা নিয়ে আসা। আর সেই শৃঙ্খলা আমার ক্ষেত্রেও যেন প্রযোজ্য হয়। আমিও যেন সেই শৃঙ্খলার বাইরে না থাকি। শুরু থেকে শিথিলতা এলে পরে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত।

প্রশ্ন: গ্রামের লোকের কাছে বা ম্যানেজিং কমিটির কাছে কোনও বাধা পাননি?

গোবর্ধন মিশ্র: এক্ষেত্রে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমি যা যা করতে চেয়েছি, সবার পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি। স্কুলের জন্মলগ্ন থেকে সেক্রেটারি ছিলেন সুধীরবাবু। অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। স্কুলের ব্যাপারে আমার কথাই ছিল শেষ কথা। কোনওদিন উনি আমার বিরোধীতা করেননি। বরং, সব কাজেই তাঁর সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি। উনু বলতেন, আপনার স্কুল আপনি সাজিয়ে নিন।

প্রশ্ন: শিক্ষক নিয়োগ কি আপনিই করতেন ?

গোবর্ধন মিশ্র: হ্যাঁ, সবকিছুই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রাক্তন ছাত্রদের শিক্ষক হিসেবে ফিরিয়ে এনেছি। অজিত, ভবতোষ, নেপালরা অন্য স্কুলে চাকরি করত। ওদের বলেছিলাম, তোমরা নিজের স্কুলে ফিরে এসো। তোমরা যদি কলেজে চান্স পাও, কথা দিলাম আটকাবো না। ওরা সবাই কমলপুরে যোগ দিল। তার আগে পাত্রবাবু এসেছেন, মণ্ডলবাবু এসেছেন। একাত্তর সাল থেকে ঘুরে দাঁড়ানো শুরু হল। সেবার আমাদের ২৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল। ২১ জন ফার্স্ট ডিভিশন। গোটা জেলায় সাড়া পড়ে গেল। এমনকি পাশের জেলা থেকেও ছেলেরা পড়তে এল।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না?

গোবর্ধন মিশ্র: না, একেবারেই ছিল না। সবাইকে বোঝাতে পেরেছিলাম, স্কুলের কাজে যেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না থাকে। ছাত্রভর্তি থেকে শিক্ষকনিয়োগ, সবকিছুই হবে স্বচ্ছভাবে। সেখানে যেন কোনও হস্তক্ষেপ না থাকে। এমনকি ম্যানেজিং কমিটিতেও নির্বাচন হত না। সব দল বলত, স্যার, আপনিই তো স্কুল চালাবেন। আপনি আপনার মনের মতো প্রতিনিধি বেছে নিন। আমরা কোনও ক্যান্ডিডেট দেব না।

প্রশ্ন: এই স্কুলে কোনওদিন বন্ধ হয়নি। এটা কীভাবে সম্ভব হল?

গোবর্ধন মিশ্র: শুরু থেকেই বলেছিলাম, এখানে কোনও বন্ধ হবে না। সেই বন্ধ যারাই ডাকুক। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটল। সিপিএমের ডাকা বন্ধ। একদল ছাত্র এল বন্ধ করতে। আমি তাদের বললাম, তোমরা জানো না, এখানে কোনও বন্ধ হয় না! তাদের বোধ হয় কথাটা ভাল লাগেনি। তারা গিয়েছিল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের কাছে। পার্থবাবু নাকি তাঁদের বলেছিলেন, 'জেলার একটা স্কুল একটু ভালভাবে ডিসিপ্লিন মেনে চলে। সেটাও তোমাদের সহ্য হচ্ছে না? এখানে ভুলেও বন্ধ করতে যেও না।'

প্রশ্ন: স্কুল থেকে নাকি যাত্রাও করিয়েছিলেন!

গোবর্ধন মিশ্র: হ্যাঁ, স্কুল বিল্ডিং করতে হত। তখন তো অনুদান তেমন পাওয়া যেত না। অনেক সময় ধার করে মাইনে দিতে হত। তাই অনেকে বলল, যাত্রা করালে লাভ হবে। যাত্রা হল। সেই টাকা থেকে ইটভাটা করলাম। সেই ইট থেকে হল স্কুল বিল্ডিং।

প্রশ্ন: সেই দিনগুলো যখন মনে পড়ে, কেমন অনুভূতি হয়?

গোবর্ধন মিশ্র: আমার জীবনের বিরাট অংশজুড়ে কমলপুর। সেদিনও ছিল, আজও আছে। অনেক ছাত্রর সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে। মনোরঞ্জন মণ্ডল তো প্রায়ই দেখে যায়। আমাকে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করিয়ে আনল। আমাদের ছাত্ররাই মাথা উঁচু করে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। একজন শিক্ষকের কাছে এর থেকে গর্বের আর কী হতে পারে! ওদের মধ্যেই তো আমাদের বেঁচে থাকা। জীবনে এর থেকে বেশি কীই বা চাওয়ার থাকে!

কথায় কথায় সন্ধে গাঢ় হয়ে এল। এর মাঝে আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি নেই। আন্তরিকভাবেই বললেন, আজ বরং থেকেই যাও। থাকতে পারলে ভালই লাগত। আরও অনেক অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেত। একটা মানুষ কীভাবে তিল তিল করে একটা প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুললেন, তার ধাপগুলো আরও স্পষ্ট হত। কিন্তু ফিরে আসতেই হত। দরজা পর্যন্ত সস্নেহে এগিয়ে দিলেন। বললেন, সাবধানে যেও। সেই প্রখর ব্যক্তিত্বের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্নেহশীল মানুষটা যেন বারেবারেই উঁকি দিয়ে গেলেন।

রাঢ় আলাপনের পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। বাসুলী প্রেস, ছাতনা, বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।**